সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মোঃ মাহবুব হোসেন
সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সম্পাদক

মোঃ আবদুর রহিম খান
মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সম্পাদনা সহযোগী

মোঃ মতিউর রহমান, যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ মোর্তজা মোর্শেদ, উপমহাপরিদর্শক, প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ ফোরকান আহসান, তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ তাওহীদুল হক ভূঁইয়া, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ আবুল হাজ্জাত সোহাগ, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
এস, এম, শাহাজাদ কবির, সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
পিংকি মজুমদার, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

প্রকাশনা

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

এপ্রিল, ২০২৪

ডিজাইন ও প্রিন্ট

বর্ণমালা কমিউনিকেশন লিমিটেড

সূচিপত্র

ক্রমিক নং.	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	শ্রমিকের অধিকার এবং আমাদের ভাবনা এ.কে.এম. সেলিম ওসমান, এমপি, সভাপতি, বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন	৩৯
০২	শ্রমিক কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা ড. আতিউর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর	৪৩
০৩	টেকসই উন্নয়নের জন্য শোভন কর্মপরিবেশের বিকল্প নেই এস. এম. মান্নান (কচি), সভাপতি, বিজিএমইএ	৪৭
০৪	বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট মোঃ আবদুর রহিম খান, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	৪৯
০৫	**Contribution of Labour Inspection to the Improvement of Labour Law** Md. Masum Billah, Law Officer, Department of Inspection for Factories and Establishments	৫৪
০৬	**Emerging Occupational Safety and Health hazards in the plastic sector** AKM Masum Ul Alam, OSH Specialist & Adjunct Faculty, BUHS	৫৯
০৭	**Behind The Scene: Tackling occupational safety and health issues** Ole R. Justesen, Sector Counsellor (OHS), Royal Danish Embassy	৬২
০৮	**Occupational Safety and Health: a new Training Center in Rajshahi and how to consolidate the governance of an Industrial Safety Framework** Dr. Michael Klode, STILE Project, GIZ	৬৪
০৯	**Role of Personal Protective Equipment (PPE) in Minimizing Risks at Work** Sk Akhtar Ahmad, Professor of Occupational and Environmental Health Bangladesh University of Health Sciences	৬৬
১০	**Bangladesh's Commitment to Occupational Safety and Health: Paving the Way for a Safer Tomorrow** Maurice L Brooks, Labour Administration and Working Conditions, ILO-Bangladesh	৭০
১১	**Emphasizing Quality or Quantity? Mapping Inspection: Optimizing Resources, Remarkable Results** Sikder Mohammad Tawhidul Hasan, Deputy Inspector General, DIFE, Ph.D. Researcher	৭২
১২	টেকসই ট্যানারি শিল্প বিনির্মাণ ও এলডব্লিউজি সনদ অর্জন মোঃ আলম হোসেন, পরিচালক ও প্রকল্প প্রধান, বিল্ডিং এ সাসটেইনেবল লেদার সেক্টর ইন বাংলাদেশ, ওশি ফাউন্ডেশন	৭৪
১৩	টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ভূমিকা আরদাশীর কবির, সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন	৭৭
১৪	**Bangladesh Tannery Industry Towards Social Accountability and LWG Certification through the implementation of National Plan of Action (NPA)** A K M Ashraf Uddin, ED, BLF	৭৯
১৫	**Occupational health and safety: the historical background** Tapas Roy Barman, Labour Inspector (General), DIFE	৮৫
১৬	উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের আলোকচিত্র ফটোগ্রাফার: রিয়াজ মাহমুদ মিঠু, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর টেকনিশিয়ান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	৮৭

শ্রমিকের অধিকার এবং আমাদের ভাবনা

এ.কে.এম. সেলিম ওসমান, এমপি
সভাপতি, বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন

প্রতি বছর ২৮ এপ্রিল আমরা আন্তর্জাতিক পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালন করি। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশের পর থেকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি টেকসই শিল্প হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমাদের এই পদক্ষেপগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিও পেয়েছে। বিগত এক দশকে দেশের কারখানাগুলোর কাঠামোগত নিরাপত্তা অনেক বেশি জোরদার করা হয়েছে, কারখানায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সংস্কৃতি। মালিকপক্ষ কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত যেকোন আলোচনার জন্য শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।

একটি ব্যবসা পরিচালনার অন্যতম মৌলিক উপাদান হচ্ছে শ্রমশক্তি। খুব অল্প কিছুদিন আগেও আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল উদ্বেগ ছিলো মূলত ব্যবসার নিজস্ব ঝুঁকি কেন্দ্রিক। কিন্তু বিশ্বায়নের এই যুগে এককেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে এখন আমরা টেকসই ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে People, Planet এবং Prosperity'র কথা বলছি। একজন শ্রমিক শুধু আমাদের ব্যবসার মৌলিক উপাদান নয়, কর্মপরিচয়ের ঊর্ধ্বে তিনি একজন ব্যক্তি মানুষ। আমরা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের সকল অধিকার নিশ্চিত করতে চাই।

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ১৯৪৮ এর ২৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক শ্রমিকের তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম, এমন ন্যায্য ও অনুকূল শ্রম পরিবেশ এবং প্রয়োজনবোধে সেই সঙ্গে সামাজিক সুরক্ষার অধিকার রয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ৭ম অনুচ্ছেদে ন্যায্য মজুরি, সমান কাজে সমান মজুরি, শোভন জীবন যাপন, স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ, কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ, বিশ্রাম ও সবেতনে ছুটি সংক্রান্ত অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। মানবাধিকার ঘোষণা, চুক্তি এবং আইএলও কনভেনশন এর আলোকে গঠিত বাংলাদেশ শ্রম আইনে কর্মঘণ্টা, ছুটি, মজুরি, মজুরি পরিশোধের সময়কাল ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ ইত্যাদি মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা হয়েছে।

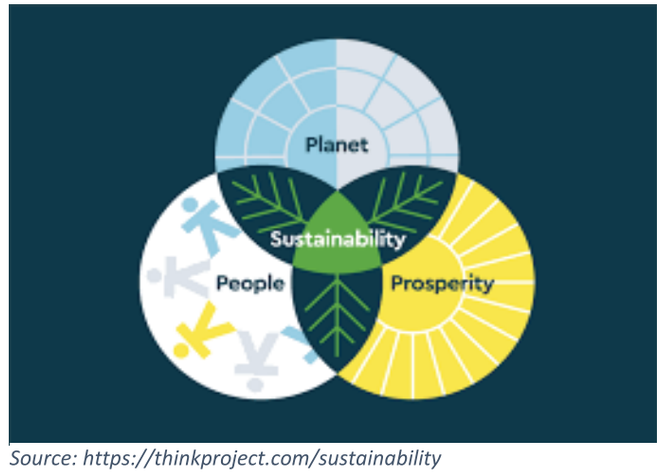

Source: https://thinkproject.com/sustainability

শ্রম আইন অনুযায়ী কারখানায় মৌলিক কম্প্লায়েন্স নীতিগুলো অনুশীলন নিশ্চিত করার পরে আমরা সামাজিক সুরক্ষাসহ, অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো নিশ্চিতের প্রতি মনোযোগী হচ্ছি।

বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বাজারের একটি বড় অংশ দখল করে আছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডার মত দেশগুলো। তবে বাংলাদেশের রপ্তানির বাজারে ইউরোপীয় ইউনিয়নও একটি প্রভাবশালী ভূমিকা রাখছে যা পোশাক রপ্তানির বাজারে প্রায় ৫০% এর বেশি। এভরিথিং বাট আরমস (ইবিএ) ইনিশিয়েটিভ এর অধীনে ইইউ এর অধিভুক্ত দেশগুলোর ক্ষেত্রে আমদানির বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ইইউতে পোশাক রপ্তানীর বাজারে চীনের পরেই বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানীর বাজারের জন্য ইইউ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বাজার। সম্প্রতি ইইউ অধিভুক্ত দেশগুলোতে ব্যবসা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে মানবাধিকার এবং পরিবেশগত বিধি মেনে চলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মানবাধিকার এবং পরিবেশগত বিধি (HREDD) অনুসারে, কর্মক্ষেত্রে শিশুশ্রম নিরসন, জোরপূর্বক শ্রম, যেকোন ধরনের শ্রম দাসত্ব নিরসন, ন্যায্য মজুরি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ব্যবসায়ের কারণে উদ্ভূত যেকোন ধরনের পরিবেশগত ঝুঁকি নিরূপন, প্রশমন এবং প্রতিরোধের নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। আনন্দের বিষয় হচ্ছে যে HREDD এর মূখ্য সূচকগুলোতে আমরা ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছি। আমাদের ভাবনা এবং কর্মপরিকল্পনা এখন মৌলিক বিষয়গুলোর বাহিরেও একজন শ্রমিকের জীবনযাপনের বাড়তি চাহিদাগুলো কিভাবে পূরণ করা যায়, সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা।

সময়ের সাথে সাথে বহু প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প বিশ্ববাজারে আজ মজবুত অবস্থান সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পখাত-নীট শিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকেএমইএ সবসময়ই সরকারের অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো বহুমাত্রিক উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট। বিকেএমইএ নীট শিল্প মালিকদের একটি অলাভজনক সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কারখানার শ্রমিক ও তাদের জীবনমান উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কারখানাতে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা ও নিরাপত্তা প্রদান করতে বিকেএমইএ তার উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

বিকেএমইএ মালিকপক্ষের সংগঠন হলেও নীট শিল্প সেক্টরের সকল স্টেকহোল্ডারদের স্বার্থ সংরক্ষণে সচেতন থাকে। আর সকল স্টেকহোল্ডারদের মাঝে শ্রমিকরা হলো এই সেক্টরের প্রাণ। একজন শ্রমিক তার কর্মক্ষেত্রে কর্মী পরিচয়ের বাইরেও তার পারিবারিক, সামাজিক বলয়ে আরও কিছু পরিচয় বহন করেন। তার কর্মজগতের বাইরেও দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি শ্রমিককে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। এইসব চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে গিয়ে একজন শ্রমিককে কতটা মানসিক চাপ বহন করতে হয় তার প্রতি সাধারণত আমরা দৃষ্টিপাত করিনা।

সম্প্রতি বিকেএমইএ-জিআইজেড যৌথভাবে নীট সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্যের সুস্থতার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধিতে "Factory Improvement Programme of BKMEA member factories on Mental Health-Psychosocial Hazard, OSH & Waste Management" প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বিকেএমইএ সদস্যভুক্ত ৭৫ টি কারখানার শ্রমিকদের মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা, মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং একটি নির্দিষ্ট চেকলিষ্ট অনুসারে কারখানা নিরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মানসিকভাবে দুর্বল কর্মী কখনোই তার সর্বোচ্চ উৎপাদনক্ষমতা দিয়ে কাজ করতে পারেনা। বরং অতিরিক্ত মানসিক চাপ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকের পেশাগত দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হয়। তাছাড়াও কারখানাতে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিষয়ে শ্রমিকদের কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ প্রয়োজন হয়। সাধারণত মেডিকেল অফিসার, ওয়েলফেয়ার অফিসার এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তারা শ্রমিকদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করে থাকে। কিন্তু কাউন্সেলিং বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং ধারণা না থাকায় সঠিকভাবে সেবা প্রদান বাঁধাপ্রাপ্ত হয়।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি কারখানার ২ জন করে অর্থাৎ সর্বমোট ১৫০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিরীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি কারখানাতে সর্বমোট তিনটি করে ভিজিট করা হবে। ইতোমধ্যে সকল কারখানার প্রথম ভিজিট সম্পন্ন হয়েছে। আমরা আশা করছি যে, এই নিরীক্ষণের মাধ্যমে আমাদের নির্বাচিত সদস্য কারখানাগুলোতে কর্মরত শ্রমিকদের প্রকল্পপূর্ব এবং প্রকল্প পরবর্তী মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং এ সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা ধারণার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরতে পারবো। কারখানা প্রতিনিধিগণও এ প্রকল্পটি অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সকল কর্মকর্তা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছে, এ প্রকল্পটি নিঃসন্দেহে শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নের সচেতনতার পাশাপাশি তাদের জীবনমান উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমাদের প্রতিটি কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমরা সচেতন থাকি যেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনার প্রতিফলন সেখানে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় তাঁর প্রতিটি বক্তব্যে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতের কথা বলেন। আমরাও তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করে সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি। "MOTHERS@WORK" প্রকল্পটি তারই একটি উদাহরণ।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বিকেএমইএ সভাপতি জনাব এ.কে.এম সেলিম ওসমান, এমপি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ

বিকেএমইএ ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় কারখানাতে কর্মরত মায়েদের মাতৃত্বের সুরক্ষা এবং অধিকার নিশ্চিত করতে "MOTHERS@WORK" প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। ইউনিসেফ বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে পরিকল্পনা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং আলোচনার মাধ্যমে কর্মী মায়েদের মাতৃত্বের সুরক্ষা এবং অধিকার নিশ্চিত করতে ৭টি ন্যূনতম মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। যে মানদণ্ডগুলি নিশ্চিত করা গেলে কর্মী মায়ের অধিকার নিশ্চিত করা সহজ হবে। শ্রম আইন অনুযায়ী আমাদের প্রতিটি কারখানাতেই ডে-কেয়ার সেন্টার এবং ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নারটি হয়ত এই মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত সুবিধাপ্রাপ্ত নয়। এ প্রকল্পের আওতায় আমরা প্রথম বছরে ৩০টি এবং দ্বিতীয় বছরে নতুন ৬০টি কারখানাতে কার্যক্রম পরিচালনা করেছি। যেখানে আমরা প্রতিটি কারখানার ৩জন মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা (ওয়েল ফেয়ার অফিসার, মেডিকেল স্টাফ, এবং ব্যবস্থাপনা কর্মী) কে ৭টি ন্যূনতম মানদণ্ড, কর্মী মায়েদের পুষ্টিকর খাবার, শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর গুরুত্ব, শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সঠিক পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন শেষে এই কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব কারখানাতে কর্মরত কর্মী মায়েদের উল্লিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। এছাড়াও এই প্রকল্প কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আমাদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কারখানাগুলোর ব্রেস্ট ফিডিং কর্নারগুলো পরিদর্শন করে সেগুলোর মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা প্রদান করেন।

অনেক মায়েরা আছেন যারা, তাদের সন্তানদের বাড়িতে নিকটাত্মীয়ের কাছে রেখে আসেন। সেক্ষেত্রে বাড়িতে তারা কিভাবে সঠিক উপায়ে বুকের দুধ সংরক্ষণ করতে পারবে, কতক্ষণ এই দুধ খাওয়াতে পারবে এই বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। লক্ষ্য একটাই কোন শিশু যেন তাদের মায়ের বুকের দুধ পান করা থেকে বঞ্চিত না হয়।

আমরা জানি আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যৎ। এই শিশুরাই আমাদের আগামী দিনের মানবসম্পদ। তাদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ নিশ্চিত করা আমাদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম অনুঘটক। সকলের জন্য টেকসই পৃথিবী নিশ্চিত করতে গেলে আমাদের People এবং Planet কে রক্ষা করেই Prosperity নিশ্চিত করতে হবে। এভাবেই আমরা মৌলিক চাহিদাগুলো নিশ্চিত করে আমাদের কর্মীদের বাড়তি সুবিধাগুলো প্রদান করতে চাই।

বৈশ্বিক তৈরি পোশাক শিল্পের বাজারে বাংলাদেশ একটি শক্ত অবস্থানে রয়েছে এটি যেমন সত্য একই সাথে প্রতিনিয়ত আমাদের উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করেই এগিয়ে যেতে হচ্ছে সেটাও পরম সত্য। এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে আমরা নির্দিষ্ট বাণিজ্যসুবিধা হারাবো। যা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে টিকে থাকতে বাড়তি চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। কারখানা মালিকগণ সবসময়েই চায় যে, তার শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা ও প্রাপ্য সুবিধা নিশ্চিত করে তাদের আরও বাড়তি কিছু দিতে। শ্রমিকেরা ভালো থাকলে, অনুপ্রাণিত থাকলে, তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাদের উৎপাদনক্ষমতা বাড়লে কারখানার ব্যবসা প্রবৃদ্ধি হয়। প্রতিটি অনুষঙ্গ আসলে আন্তঃসম্পর্কিত। বিপরীতভাবে, ব্যবসা পরিচালনা প্রতিবন্ধকতাহীন না হলে, উদ্যোক্তাদের জন্য শ্রমিকের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করাও কঠিন হয়ে ওঠে।

তৈরি পোশাকের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, বিভিন্ন অযৌক্তিক ইস্যুতে নির্ধারিত মূল্যে ডিসকাউন্ট চাওয়া, দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে অনীহা, বিভিন্ন ক্রেতার বিবিধ অডিট ভীতি, প্রতিনিয়ত আমাদের উদ্যোক্তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে শুল্কমুক্ত বাণিজ্যসুবিধা হারানোর পরে বিকল্প কোন উপায়ে বাণিজ্যসুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ অন্বেষনে আমাদের পাশাপাশি সরকার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণের বিনীত অনুরোধ করছি। আমাদের মনে রাখতে হবে তৈরি পোশাক শিল্প আমাদের ক্রমশ অগ্রগামী অর্থনীতির অন্যতম বুনিয়াদ। এই শিল্পের উপর হুমকি সৃষ্টি হলে তা আমাদের সমগ্র অর্থনীতির জন্যও হুমকি সৃষ্টি করবে।

আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আস্থাশীল কারণ যতবারই ঝড় এসেছে, তাঁর দক্ষ নেতৃত্বে আমরা ঠিকই এগিয়ে গিয়ে সকল বাঁধা পেরিয়ে মাথা উঁচু করে বিশ্বের বুকে আমাদের অস্তিত্ব ধরে রেখেছি। বিকেএমইএ নীট শিল্পে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকে,তার নীতিগত দায়বদ্ধতা হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। আমরা নিয়মিত আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে মালিকপক্ষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, শ্রমিকের মানবাধিকার নিশ্চিত করা একটি বিনিয়োগ, যার ফলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, শ্রমিকদের কাজে অনুপস্থিতির হার কমে, মাইগ্রেশন কমে, উৎপাদনশীলতা বাড়ে, ক্রেতার আস্থা বাড়ে। মালিক এবং শ্রমিক উভয়ই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাকে আমরা জিরো টলারেন্স হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশের নীট সেক্টরের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছি।

শ্রমিক কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা

ড. আতিউর রহমান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং
বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

শ্রমিক কল্যাণ নিয়ে এই আলোচনাটি এমন একটি সময়ে তুলছি যখন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি দানা বেধেছে। প্রথমে করোনাজনিত অর্থনৈতিক অচলাবস্থা এবং তার ওপর রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ ও অন্যান্য ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনের সঙ্কটের কারণে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি নিঃসন্দেহে একটি চ্যালেঞ্জিং সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশেষত বাইরের এই সঙ্কটগুলোর কারণে আমাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত সঙ্কটগুলোও নতুন করে প্রকট হয়ে ধরা দেয়ায় সম্ভবত বিগত ১০-১৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম এতো বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বলা বাহুল্য যে, এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যেও যে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি মোটামুটি ছয় শতাংশের আশেপাশেই প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে এর পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখে চলেছে আমাদের প্রবাসী আয়ের প্রবাহ, আমাদের কৃষি উৎপাদন এবং সর্বোপরি আমাদের রপ্তানিমুখী শিল্পগুলো। এই প্রেক্ষাপটে তাই শ্রমিক কল্যাণ নিয়ে ভাবনা ও আলোচনা বিশেষ প্রাসঙ্গিক। কারণ আপদকালীন সময়ে শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা গেলেই সংকট উত্তরণে আমাদের শ্রমঘন শিল্প খাত থেকে প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক সুফল পাওয়া সম্ভব। দিনশেষে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শিল্পেই। সেই পথেই বাংলাদেশ এখন হাঁটছে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোসহ মেগা প্রকল্পগুলো পুরোপুরি চালু হয়ে গেলে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি আরও গতিময় হবে। আর সেই সুবাদে শ্রমিকের কর্মসংস্থান ও সুযোগ-সুবিধেও বাড়বে।

স্বল্পমেয়াদে এই চ্যালেঞ্জিং সময়ে তো বটেই এমন কি দীর্ঘতর মেয়াদে শ্রমিকবান্ধব অর্থনৈতিক বিকাশের পথ-নকশা তৈরির ক্ষেত্রেও শ্রমিক কল্যাণ বিষয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর এ বিষয়ক দর্শন ও চর্চাগুলো আমাদের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমরা সচরাচর যে সমস্ত দেশকে উন্নত হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি তাদের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে বাংলাদেশের মতো যে সমস্ত স্বল্পোন্নত দেশে দ্রুত সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিকাশের পথে এগিয়েছে তাদের বাস্তবতার বিশেষ ফারাক রয়েছে। এই পার্থক্যের বিষয়ে সচেতন না থাকলে শ্রমিক কল্যাণের নামে এমন নীতি প্রণীত হতে পারে যাতে করে স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে শিল্পের বিকাশই বাধাগ্রস্ত হবে। আর তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে শ্রমিকদেরই।

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা লগ্নেই এ বিষয়ে নীতি-সংবেদনশীলতা দেখা যায়। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর মতে, শ্রমিক স্বার্থ বিষয়ে উন্নত দেশগুলোর স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ না করে নিজস্ব বাস্তবতার বিষয়ে সচেতন থেকে বাংলাদেশের শ্রমনীতি প্রণীত হওয়ায় আমাদের শিল্পখাতের বিকাশ সহজতর হয়েছে। ব্রিটিশ ভারতের ১৯৪৭ সালের 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট'-এ শ্রমিক নিয়োগ বিষয়ে ব্যাপক কড়াকড়ি ছিল। ভারত এই আইনটি নিয়েই স্বাধীন দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করে। অন্যদিকে, পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হয়ে যখন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এদেশে যাত্রা শুরু করে ঐ আইনটি ছাড়াই। ফলে বাংলাদেশের শিল্পোদ্যোক্তারা সহজেই বেশি সংখ্যক সস্তা শ্রমিককে নিয়োজিত করতে পেরেছিলেন। এতে একদিকে কম মূল্যে বিশ্ব বাজারে পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ দেয়ার ফলে কর্মসংস্থান বেড়েছে এবং অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার সুফল বেশি বেশি বণ্টন করা সম্ভব হয়েছে।

উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর শ্রম আইনের কড়াকড়ি সঙ্গত কারণেই বঙ্গবন্ধু অনুসরণ করেননি। কেননা সে সময় সদ্য-স্বাধীন দেশে ঐ অর্থে উদ্যোক্তা শ্রেণীই ছিল না। এমন কড়াকাড়ি আরোপ করলে নতুন উদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশই বন্ধ হয়ে যেতো। তবে স্বাধীন দেশের সংবিধানে বঙ্গবন্ধু ঠিকই শ্রমিকের কল্যাণ ও স্বার্থের যথাযথ অগ্রাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তির কথা বলা হয়েছে: "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে মেহনতি মানুষকে- কৃষক ও শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশ সমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা"। ১৫ (খ) অনুচ্ছেদে কর্ম ও মজুরির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে: "কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করে যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার; যুক্তিসংগত বিশ্রাম বিনোদন ও অবকাশের অধিকার।" ৩৪ অনুচ্ছেদে জবরদস্তি- শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে: "সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম; এবং এই বিধান কোনোভাবে লংঘিত হইলে আইনত; দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।" বঙ্গবন্ধু নিখাদ আন্তরিকতায় স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকারের বিষয় অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

সংবিধানে শ্রমিক অধিকারের এহেন স্বীকৃতি ঐ সময়ের প্রেক্ষাপটে ছিলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা সে সময় দেশীয় উদ্যোক্তা শ্রেণীর অনুপস্থিতির কারণে বড় শিল্পগুলো ছিলো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন ঐ সব কারখানায় পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা নিঃসন্দেহে সংবিধানের নির্দেশনা মেনে চলার ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানাধীন কারখানার পরিচালকদের চেয়ে বেশি তৎপর হবেন- এমনটিই ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাশা। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানার কারখানার প্রতি শ্রমিকদের দায়িত্বশীলতাও বেশি হবে কেননা তারাও এক অর্থে এই কারখানার মালিক। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু নিজেই ১৯৭২-এর ১৯ জুলাই আদমজীনগরে শ্রমিক সমাবেশে বলেছিলেন- " ... ফ্যাক্টরি এখন আর আদমজী নাই, ফ্যাক্টরি এখন আর বাওয়ানীর নাই, ফ্যাক্টরি এখন আর দাউদের নাই, ফ্যাক্টরি এখন হয়েছে সাড়ে সাত কোটি লোকের সম্পত্তি। ... আপনারা প্রোডাকশন বাড়াবেন, আপনারাও খাবেন আর ঐ যে গরীব কৃষক, যাদের টাকায় এই কল-কারখানা গড়ে উঠে। তারাও এ টাকার ভাগ পাবে ...।"

শ্রমিক কল্যাণ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর দর্শনকে আরও ভালোভাবে বুঝতে ফিরে যেতে হবে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগের সময়ে। একেবারে যে সময় বঙ্গবন্ধু একজন তরুণ রাজনীতিক, সে সময়টায়। ঐ সময়ে শ্রমিক স্বার্থ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাগুলো সবচেয়ে স্পষ্ট প্রতিফলন পাওয়া যায় তাঁর ১৯৫২ সালে চীন সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থটিতে। গণমুখী রাষ্ট্রে কৃষক আর শ্রমিকের স্বার্থই যে মূখ্যতম অগ্রাধিকারের বিষয় হওয়া উচিৎ ছিলো তরুণ বঙ্গবন্ধু সে বিষয়ে সদাসচেতন ছিলেন। তাই তরুণ বয়সে গণচীন সফরে গিয়ে নানকিংয়ের কৃষি ফার্মের মতোই আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন সাংহাইতে অবস্থিত বৃহৎ কাপড়ের কলের ব্যবস্থাপনা। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে তাঁরা এই কলটি পরিদর্শন করেছিলেন। কমিউনিস্ট দেশেও মিলটি একটি কোম্পানি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছিল। একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক তা চালাচ্ছিলেন। তার মানে চীনে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মিলেই মিলটি চালাচ্ছিলেন। মিলগুলো জাতীয়করণ না করেও এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে সকল পক্ষই লাভবান হতে পারেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন- "সরকারকে হিসাব দাখিল করতে হয়। যে টাকা আয় হবে তা শ্রমিকদের বেতন, তাদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত, চিকিৎসার জন্য ব্যয় করতে হবে। আর যা বাঁচবে তা দিয়ে মিলের উন্নতি করতে হবে। আর যারা মালিক তাদের লভ্যাংশের কিছু অংশ দেয়া হয়।" তিনি আরও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এই দেশে যে মেয়ে শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য শিশুযত্ন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। যুবক শ্রমিকরা কয়েকজনে মিলে বাড়িতে বাস করার সুযোগ পেয়েছেন। শ্রমিকদের জন্য আলাদা হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সফর শেষে শ্রমিক ও মালিকদের পক্ষ থেকে তাদের সংবর্ধনা দেয়া হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি উভয়ে বলেন, "আমরা শ্রমিক ও মালিক পাশাপাশি দেশের কাজ করছি। মিলটা শুধু মালিকের নয়, শ্রমিকের ও জনসাধারণেরও। আজ আর আমাদের মধ্যে কোনো গোলমাল নাই। আমরা উভয়েই লভ্যাংশ ভাগ করে নেই। শ্রমিকের স্বার্থও আজ রক্ষা হয়েছে, মালিকের স্বার্থও রক্ষা হয়েছে।" (আমার দেখা নয়াচীন, পৃষ্ঠা ৭০)।

তরুণ বয়সে বিপ্লবোত্তর চীনে শ্রমিকদের ক্ষমতায়িত করার কৌশলগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু। ভবিষ্যতে নিজে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেলে শ্রমিক কল্যাণে কী করবেন তার পথ-নকশাই হয়তো সে সময় তিনি দাঁড় করাচ্ছিলেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে বৃহৎ শিল্প যখন রাষ্ট্রীয়করণ করেছিলেন তখন কারখানা ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তাঁর নেয়া উদ্যোগগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে এমনটিই মনে হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই ১৯৭৩-এ আদমজীনগরের ভাষণে (উল্লিখিত) বক্তৃতায় বলেছিলেন- "প্রত্যেকটা কল-কারখানা আপনাদেরই (শ্রমিকদেরই) করতে হবে। সেভাবেই ম্যানেজমেন্ট বোর্ড হবে। সরকারের থাকবে, কর্পোরেশনের থাকবে আর শ্রমিকদের প্রতিনিধি থাকবে ... আপনারা শ্রমিকরা ভোট দিয়ে পাশ করে দিবেন, দুইজন আপনার, একজন ব্যাংকের, একজন গভর্নমেন্টের, একজন হলো আপনার জুট কর্পোরেশনের। পাঁচজনে বসে কলকারখানা

চালাবেন। ...আপনাদের কলে যা আয় হবে, তার একটা অংশ আপনাদের শ্রমিকদের জন্য ব্যয় হবে, আরেক অংশ জনগণের জন্য ব্যয় হবে। সরকারের কাছে যাবে।" শ্রমিকদের কল্যাণের ভার এভাবেই তিনি শ্রমিক প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। রাষ্ট্রের হাতে রেখেছিলেন শ্রমিকদের ক্ষমতায়িত হওয়ার পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব। বাংলাদেশের তখনকার বাস্তবতায় এই পদ্ধতিটি সত্যিই সময়োপযোগী ছিল।

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিতেও এই ধারাবাহিকতা তিনি রক্ষা করেছিলেন। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রমকে বেগবান এবং অংশগ্রহণমূলক করতে সে সময় সকল মহকুমাকে ডিস্ট্রিক্ট-এ রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। আর প্রতিটি থানার সার্বিক তদারকির জন্য একটি করে 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল' গঠনের প্রস্তাবনা ছিল তাঁর। আর সেই কাউন্সিলে আলাদা করে শ্রমিকদের প্রতিনিধি রাখার পরিকল্পনা দিয়েছিলেন তিনি, যাতে করে থানাভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াতেও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হতো। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) কমিটিতে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- "এক বছরের মধ্যে থানা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল করতে হবে। সেখানে বাকশালের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে, কৃষকদের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে, শ্রমিকদের থাকবে, যুবকদের থাকবে, মহিলাদের থাকবে।" অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনায় আলাদাভাবে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার এই প্রচেষ্টা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পরিক্রমায় অংশীজন হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যে একান্ত জরুরি সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশেষ সংবেদনশীল।

নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণ ও তাদের বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণগুলো বিষয়েও বঙ্গবন্ধু বিশেষ সচেতন ছিলেন। কখনো ধর্ম, কখনো জাতীয়তা, কখনো কে কোন জেলা থেকে আগত- ইত্যাদি ইস্যু তুলে শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার মাধ্যমে শ্রমিক কল্যাণ প্রায়শই ব্যাহত হয়েছে পাকিস্তান শাসনামলে। আর শ্রমিকদের মধ্যে এই বিভেদ বিরাজ করলে জাতীয় রাজনীতিতে বিশেষ শক্তি হিসেবে শ্রমিকদের অংশগ্রহণও বাধাগ্রস্ত হয়। পূর্ব বাংলার শ্রমিকরা যেন জাতীয় রাজনৈতিক অধিকারের আন্দোলনে কার্যকর শক্তি হিসেবে সামনে আসতে না পারে সে জন্য পাকিস্তানী অপশাসকরা প্রায়শই এ দেশের শ্রমিকদের মধ্যে এ ধরনের বিভেদ তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ১৯৫৪-তে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ঐক্যজোট যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক নির্বাচনে জয়ী হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করার পরপরই তাই আদমজীতে শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির পায়তারা দেখা গিয়েছিলো। সে সময় বঙ্গবন্ধু কনিষ্ঠতম মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। নির্বাচনে জয় কিংবা মন্ত্রীত্ব পাওয়া উদযাপনের পরিবর্তে শপথ নিয়েই তিনি ছুটে গিয়েছিলেন ঐ দাঙ্গা নিরসন করতে। স্বাধীনতা উত্তর কালেও এহেন বিভেদ বৃহত্তর শ্রমিক কল্যাণ ও জাতীয় অগ্রগতির পথে হুমকি তৈরি করতে পারে- এমন আশঙ্কা বঙ্গবন্ধুর ছিল। তাই বার বার শ্রমিকদের বিভেদের রাজনীতি থেকে বিরত থাকার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। আগেই আদমজীনগরে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে তাঁর দেয়া যে ঐতিহাসিক ভাষণের কথা উল্লেখ করেছি সেখানেও এ বিষয়টি তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন- "আদমীজতে রক্ত আমি দেখেছি, ১৯৫৪ সালের রক্ত আমি দেখেছি। মন্ত্রী হয়েছিলাম, শপথ নিয়েছিলাম, মন্ত্রীর দ্বার থেকে সোজা আমি '৫৪ সালে এই পথে দৌড়াইয়া আদমজীতে আসার চেষ্টা করি। তখন তোমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। ... মন্ত্রী হয়ে আদমজীতে এসেছিলাম, সে জন্য মন্ত্রিত্ব ডিসমিস করে সমস্ত মন্ত্রী থেকে বাদ দিয়ে আমাকে জেলে নিয়েছিল। ... যদি আমার শ্রমিক ভাইদের মধ্যে আজকে (স্বাধীন বাংলাদেশে) এই কথা হয়- অমুক নোয়াখালীর, অমুক ঢাকার, অমুক কুমিল্লার, অমুক ফরিদপুরের- এর আগে কি আমার মৃত্যু ভালো ছিল না? বলেন আপনারা ওয়াদা করতে হবে যে, আমরা এক, আমরা বাঙালী ...।"

বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে আজও শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখা একই রকম জরুরি। এখনও দেশ-বিরোধী চক্র শ্রমিকদের বিপথগামী করে তথাকথিত শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত করে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে তৎপর হতে পারে। এ কারণেই বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ অনুসরণ করা একান্ত জরুরি। আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির ভিত্তিকে মজবুত করতে শ্রমিকরা যে ভূমিকা রাখছেন তার স্বীকৃতি বার বার দিতে হবে। একই সঙ্গে কোন স্বার্থান্বেষী মহল যেন শ্রমিকদের ব্যবহার করে আমাদের অর্জনগুলো ধুলিসাৎ করতে না পারে তার জন্য শ্রমিকদের সচেতন করে তুলতে হবে। আশার কথা ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে শারীরিকভাবে হারানোর পর বহু ত্যাগের বিনিময়ে হলেও দেশ আবার বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই ফিরেছে। এই নতুন অভিযাত্রায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধুরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শ্রমিক কল্যাণকে তিনিও একই রকম অগ্রাধিকার দিয়ে চলেছেন। চ্যালেঞ্জিং সময়েও তাই জাতীয় মজুরি কমিশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ন্যূনতম মজুরি বাড়ানো হচ্ছে (সর্বশেষ বেড়েছে গত বছর)।

বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে শ্রমিক স্বার্থের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অর্জন অবশ্য এসেছে শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে। ইতোমধ্যে বিশ্বের শীর্ষ পরিবেশবান্ধব আরএমজি কারখানাগুলোর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (২০৯টি) বাংলাদেশি হওয়ায় এক্ষেত্রে যে বাংলাদেশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে তা বলাই যায়। আরও বিপুল সংখ্যক কারখানা এখন সবুজ হওয়ার পথে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও সবুজ অর্থায়নের কৌশল গ্রহণ করে এই সবুজ রূপান্তরকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। শোভন কর্মসংস্থানের বিষয়টি এখন গুরুত্ব পাচ্ছে। আশার কথা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে সবুজ কারখানার সংখ্যা বাড়ছে বলেই শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়ছে। রানা প্লাজা বিপর্যয়ের পর আমাদের আরএমজি খাত নিয়ে অনেকেই শঙ্কায় পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সকল অংশীজন মিলে কমপ্লায়েন্ট কারখানার পরিবেশ উন্নয়নে মনোযোগ দেয়ায় সেই আশঙ্কা সত্য হয়নি। বরং কাজের পরিবেশ উন্নত করার সুবাদে আমাদের সুনাম বেড়েছে।

বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কারখানার লভ্যাংশ শ্রমিক কল্যাণে ব্যয়ের পরিকল্পনা সে সময়কার শ্রমিক প্রতিনিধিরা করতে পারছিলেন। আজ রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা হাতেগোনা। শিল্প মূলত ব্যক্তি খাত নির্ভর। তবে ব্যক্তি খাতের দেয়া কর থেকে সরকারের যে আয় হয় তার একটি অংশ শ্রমিক পরিবারগুলোর কল্যাণে বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নিশ্চয় ব্যয় করা যায়। ফলে আজকের পরিবর্তিত বাস্তবতাতেও বঙ্গবন্ধুর দর্শন বাস্তবায়িত করা খুবই সম্ভব। শ্রমিকদের ক্ষমতায়িত করতে কেবল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি-কেন্দ্রিক ভাবনাই ভাবতে হবে এমন নয়। আজও আমাদের দেশের অধিকাংশ শ্রমিকই অদক্ষ। শিল্প খাতের আধুনিকায়ন (অটোমেশন), আন্তর্জাতিক বাজারে বাড়তি প্রতিযোগিতা, এবং সর্বোপরি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে অদক্ষ শ্রমিকেরা বাড়তি ঝুঁকিতে রয়েছেন। তাদেরকে দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমেও তাদের ক্ষমতায়ন করা সম্ভব। এভাবে বঙ্গবন্ধুর শ্রমিক কল্যাণের দর্শনের মূল সুরটি ঠিক রেখে পরিবর্তিত বাস্তবতার উপযোগী করে নতুন করে শ্রমিক কল্যাণের পথ-নকশাই আমাদের দাঁড় করাতে হবে।

টেকসই উন্নয়নের জন্য শোভন কর্মপরিবেশের বিকল্প নেই

এস. এম. মান্নান (কচি)
সভাপতি
বিজিএমইএ

বিশ্বায়নের এই যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সকল আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সাসটেইনেবিলিটি তথা টেকসই উন্নয়ন একটি অপরিহার্য বিষয়। আর শিল্পে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাকখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৫% আসে এই খাত থেকে; আর জিডিপিতে এই শিল্পের অবদান প্রায় ১১%। এই শিল্পের সাথে সরাসরি জড়িয়ে আছে ৪০ লক্ষ শ্রমিকের জীবিকা, যার প্রায় ৬০% নারী। আর ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজসহ বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে সব মিলিয়ে প্রায় ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৫ কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা, এবং অর্থনীতির বেশ কিছু খাত এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল। তাই আগামী দিনে আমাদের অর্থনীতির গতিপ্রবাহ অনেকটাই এই শিল্পের টেকসই বিকাশের উপর নির্ভর করছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, নব্বইয়ের মাঝামাঝি সময় থেকে পোশাক শিল্পে শিশুশ্রম নির্মূল, শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি প্রদান নিশ্চিতকরণ, কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধিসহ সোশ্যাল কমপ্লায়েন্সের সকল ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। বিগত দশকে পোশাকখাতে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটার পর পোশাক শিল্পে নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরির এক অভূতপূর্ব প্রয়াস শুরু হয়। এক দশকে উদ্যোক্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিনিয়োগ, এবং সরকার, আন্তর্জাতিক ক্রেতা, শ্রমিক সংগঠন, ILO ও উন্নয়ন সহযোগিদের সম্মিলিত সহযোগিতায় আজ বাংলাদেশের পোশাকশিল্প একটি নিরাপদ শিল্পের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বে নিজের অবস্থান তৈরি করতে পেরেছে। বর্তমানে পোশাক শিল্পে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং রেমিডিয়েশন পর্যবেক্ষণ করার জন্য একক মনিটরিং সংস্থা হিসেবে আরএমজি সাসটেইনেবলিটি কাউন্সিল বা RSC কাজ করছে, যা আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ব্র্যান্ড, শিল্প সংগঠন পোশাক উৎপাদনকারী এবং ট্রেড ইউনিয়ন এর সমান প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ সরকার আইনী সংস্কার ও প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ২০১৩ এবং ২০১৮ সালে শ্রম আইন সংস্কার, ২০১৫ সালে শ্রম বিধিমালা প্রণয়ন ও ২০২২ সালে তা সংস্কার, প্রত্যেক কারখানায় সেইফটি কমিটি ও নির্বাচিত পার্টিসিপেশন কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা অন্যতম। এ শিল্প সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ ও ক্রেতা কর্তৃক মনোনীত অডিটরগণও কমপ্লায়েন্স বিষয়টি তদারক করে থাকে। আরো বেশকিছু কারখানা ILO কর্তৃক পরিচালিত বেটার ওয়ার্ক এর আওতায় পর্যবেক্ষিত হচ্ছে। সাথে সাথে বিজিএমইএ'তে নতুন সদস্য কারখানা অর্ন্তভুক্তির ক্ষেত্রে আইনের মৌলিক বিষয়গুলোর পাশাপাশি ভবন নিরাপত্তা, অগ্নি নিরাপত্তা ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার বিষয়টিও কঠোরভাবে দেখা হচ্ছে। কাজেই কমপ্লায়েন্সের দিক থেকে আমাদের পোশাক শিল্প সম্পূর্ণরূপে ট্রান্সপারেন্ট।

জিআইজেড এবং আইএলও এর সহযোগিতায় এখন পোশাক শিল্পে এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম (ইআইএস) পাইলট ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। ৩ বছর মেয়াদী এ প্রকল্প ২১ জুন, ২০২২ থেকে শুরু হয়েছে, যার আর্থিক অনুদান দিয়েছে ৪০টির বেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান।

পোশাক শ্রমিকদের কল্যাণ ও মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য বিজিএমইএ নানা কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর এবং চট্রগ্রামে ৮টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং চট্রগ্রামে একটি হাসপাতালের মাধ্যমে শ্রমিক ভাইবোনদেরকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিমাসে প্রায় ১১ হাজার শ্রমিক ভাইবোন স্বাস্থ্যসেবা নিচ্ছেন। এ ছাড়াও ঢাকার মিরপুরে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালের নির্মাণ কাজ চলছে।

আমরা পোশাক কারখানায় কাজ করা মেয়েদের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগও তৈরি করেছি। বর্তমানে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনে ৯০ জন নারী কর্মী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছেন। অনেক কারখানা নিজ নিজ ভবনে শ্রমিক ভাইবোনদের জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকান ও তাদের সন্তানদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার পরিচালনা করছে। শিল্পে এ ধরনের আরও অনেক ভালো চর্চা/উদ্যোগের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আজ আমাদের পোশাক কারখানাগুলো কেবল নিরাপদ কর্মপরিবেশ'ই নিশ্চিত করছেনা বরং আধুনিক, জ্বালানি-সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব হয়ে উঠছে। USGBC কর্তৃক প্রত্যয়িত বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক সবুজ LEED কারখানার আবাসস্থল বাংলাদেশ। সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, আমাদের LEED সার্টিফাইড সবুজ কারখানার সংখ্যা ২১৫টি, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, দীর্ঘদিন ধরে আমরা ইউনিফাইড কোড অব কন্ডাক্ট এর দাবী জানিয়ে আসছি। যদিও শ্রম অধিকার নিয়ে উন্নত দেশগুলো ডিউ ডিলিজেন্স বিধিমালা করছে, তবে ইউনিফাইড কোড অব কন্ডাক্ট এর বিষয়ে কোন দৃশ্যমান অগ্রগতি এখনও হয়নি। আমরা মনেকরি ভিন্ন ভিন্ন স্যোশাল অডিটের পরিবর্তে ইউনিফাইড কোড অব কন্ডাক্ট প্রবর্তন করা হলে কমপ্লায়েন্সের বিষয়টি আরও সহজ ও স্বচ্ছ হবে, খরচ কমবে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প এখন প্রবৃদ্ধির পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে। এরই আলোকে আমরা বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি অভীষ্টগুলোর সঙ্গে সংগতি রেখে পোশাক শিল্পের জন্য টেকসই কৌশলগত রূপকল্প-২০৩০ নির্ধারণ করেছি। এই রূপকল্পের প্রথম অগ্রাধিকার হচ্ছে জনগণ। অর্থাৎ শিল্পের ভেতরে-বাহিরে, ব্যাপক অর্থে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা অব্যাহত রাখা আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। সকল পরিস্থিতিতেই আমরা শ্রমিক ভাইবোনদের স্বার্থ ও কল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। কারণ শ্রমিক ভাইবোনেরাই এই শিল্পের মূল চালিকাশক্তি এবং তারা ভালো থাকলে শিল্প ভালো থাকবে।

উৎপাদনের প্রবহমান ধারা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাপূর্ণ দেশের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পোশাক শিল্প অনবদ্য ভূমিকা পালন করে চলবে, ইনশাআল্লাহ।

জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

মোঃ আবদুর রহিম খান
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

প্রেক্ষাপট:

বিগত দুই দশকে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ ধীরে ধীরে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দেশ হতে শিল্প ও সেবানির্ভর অর্থনীতির দেশে পরিণত হতে চলেছে। বিকাশমান শিল্পের মধ্যে তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল, চামড়া, প্লাস্টিক, পাদুকা ও কৃষিভিত্তিক শিল্প অন্যতম। শিল্প বিকাশের ফলে একদিকে যেমন বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে অন্যদিকে পেশাগত দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। অতীতে আরএমজি ও নন-আরএমজিসহ বিভিন্ন কারখানায় ভবন ধস ও অগ্নি দুর্ঘটনায় শ্রমিক হতাহতের ঘটনা দেশের সামগ্রিক পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাঠামোর দুর্বলতাকে চিহ্নিত করেছে। ফলে বিদ্যমান শ্রম আইন এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের নিরিখে দেশের শিল্পখাতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিধানাবলী সমুন্নত রাখা সকলের নৈতিক দায়িত্ব। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ফলে একদিকে শ্রমিক অধিকার রক্ষা হয় অন্যদিকে শিল্পখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, পেশাগত ব্যাধি নিরসন এবং ঝুঁকি হ্রাসে মনোযোগ দেওয়া সময়ের দাবি।

বর্তমান সরকারের সঠিক নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নের ফলে ২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নীত হতে যাচ্ছে ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নের সাথে সাথে বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ আগের যেকোন সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে এবং বিদেশে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং ইমেজ তৈরি করা সহজতর হবে। এর জন্য শিল্পখাতের বিনিয়োগকারী ও অংশীজনদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিধানগুলো যথাযথভাবে অনুসরণের আবশ্যকতা রয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে শ্রমিক, সাধারণের মধ্যে পেশাগত শিক্ষা ও জ্ঞানের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। তাই পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ভূমিকা সমন্বয়পূর্বক শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে সরকারি তদারকি বৃদ্ধি প্রয়োজন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এর ১৪ ও ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল শ্রমিকের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন ১৫৫, ১৮৭ ও ১৬১; প্রটোকল ১৫৫ এবং সুপারিশ ১৬৪ ও ১৯৭ এ কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। ফলে সময়ের চাহিদা ও বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও কনভেনশন যথাযথভাবে প্রতিপালনের লক্ষ্যে সরকার ২০১৩ সালে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা' প্রণয়ন করে। এ নীতিমালার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির কর্মপরিবেশের উন্নয়ন, যাতে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে মৃত্যু, জখম হওয়া বা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া ক্রমাগতভাবে হ্রাস পায় এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও বৈশ্বিক দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়। এছাড়া পরবর্তীতে এসডিজি ৮.৮.১ এ পেশাগত

কাজে মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন আহত হওয়ার ঘটনা কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যা সরাসরি দেশের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩'-এ বিভিন্ন নৈতিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতা উল্লেখের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দায়িত্ব বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণে বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট স্থাপন, সেইফটি বিশেষজ্ঞ তৈরি ও নিয়োগ উদ্ধুকরণ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, জরিপ ও গবেষণা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দেশে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের আইনানুগ অধিকার, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ২০১৫ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের চাহিদা বিবেচনায় একটি পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একনেক সভায় ১৬৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার প্রাক্কলন ব্যয়ে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের সামগ্রিক পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উন্নতি বিধানকল্পে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা করা।

১ নভেম্বর ২০১৮ সালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন মেয়র এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে রাজশাহীতে ইনস্টিটিউট এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২১ সালে সমাপ্ত করার সময় নির্ধারিত হলেও কোভিট-১৯ মহামারির কারণে নির্মাণ কাজ প্রলম্বিত হয়। বর্তমানে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHTRI)-এর অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। রাজশাহীতে অবস্থিত এ প্রতিষ্ঠানটি শ্রীলংকা ও সিঙ্গাপুরের মতো দক্ষিণ এশিয়ায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য ইনস্টিটিউট হতে চলেছে।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHTRI) এর একাডেমিক ভবন

সংক্ষেপে ইনস্টিটিউটের পরিচিতি ও প্রধান কার্যক্রম নিম্নরূপ:

অবকাঠামো:

ইনস্টিটিউটটি রাজশাহী মহানগরের কেন্দ্রস্থলে সেনানিবাসের সম্মুখে ৫ একর জায়গা নিয়ে অবস্থিত। এখানে একটি ৪ তলা একাডেমিক ভবন, মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক দুটি ৬ তলা বিশিষ্ট হোস্টেল, এছাড়া একটি টিচার্স কোয়ার্টার, একটি ব্যাচেলর কোয়ার্টার, একটি ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার, একটি ইনস্টিটিউট প্রধানের বাংলো, একটি ইন্সপেকশন বাংলো এবং একটি স্টাফ কোয়ার্টার রয়েছে। একাডেমিক ভবনে প্রশিক্ষণ কক্ষ, ক্রেন সেইফটি ল্যাব, রিগিং প্রেস ল্যাব, কেমিক্যাল ল্যাব, ফায়ায় ল্যাব, লাইব্রেরি রুম, কমন রুম, স্কিল ডেভেলপমেন্ট রুম, দৃষ্টিনন্দন ক্যাফেটেরিয়া ও মাল্টিপারপাস হল রুম রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে আপদকালীন জরুরী বহির্গমন ও অগ্নি দুর্ঘটনাকালীন বহির্গমনের জন্য একমুখি সিঁড়ি এবং কেন্দ্রীয়ভাবে অগ্নি নির্বাপন সুবিধা সংবলিত আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রেখে বাগান, পুকুর ও খেলার মাঠ রাখা হয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল:

প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য ১৪৫ জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো ২০শে জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ এবং ১৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আওতায় "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট" স্থাপন ও ৫ম হতে ১০ম গ্রেডের ১৩টি পদ সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। ১১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আওতায় "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট" স্থাপন এবং ১৩টি পদের সরকারি মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়। ১৩ জন জনবলের মধ্যে একজন যুগ্মমহাপরিদর্শক, ৪ জন উপমহাপরিদর্শক, ২ জন সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি), একজন সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), একজন সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), দুইজন শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি), একজন শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য), একজন শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) রয়েছেন। প্রস্তাবনায় প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্ব পালনের জন্য একজন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে দেয়া হলেও বর্তমানে একজন যুগ্মমহাপরিদর্শক (৫ম গ্রেড) এর কর্মকর্তাকে প্রধান করে জনবল অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

কার্যক্রম:

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটে (NOSHTRI) মূল কার্যক্রমসমূহ হলো প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা, গবেষণা এবং কনসালটেন্সি সার্ভিস। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এ ৫টি অনুষদ রয়েছে: (১) প্রশাসন (২) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (৩) গবেষণা ও উন্নয়ন (৪) পেশাগত স্বাস্থ্য এবং (৫) পেশাগত নিরাপত্তা। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা এবং উপদেষ্টাবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিভিন্ন বিষয়ের উপর এবং বিভিন্ন মেয়াদী ৪২টি কোর্সের কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে। এ কাজে মালিক, শ্রমিক, সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, সেক্টরভিত্তিক অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আলোচনা এবং ট্রেনিং নিড অ্যাসেসমেন্ট (TNA) সম্পাদনপূর্বক কোর্স কারিকুলামসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের শ্রম আইন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ের উপর বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ আয়োজন। বিভিন্ন কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিক, সুপারভাইজার, ব্যবস্থাপক ও মালিকদের জন্য চাহিদা মোতাবেক প্রশিক্ষণ প্রদান। এছাড়াও বিভিন্ন সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করা। মূলত বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য আগ্রহীদের জন্য সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা হবে। কোর্সসমূহের মধ্যে পেশাগত নিরাপত্তা বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স, পেশাগত স্বাস্থ্য বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স, বিভিন্ন মেয়াদী পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন ও বিধি বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট সার্টিফিকেট কোর্স উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক এক বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করা হবে।

গবেষণা:

পরিদর্শন দপ্তরের জন্য যুগোপযোগী পরিদর্শন স্ট্যান্ডার্ড, কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ ও সুপারিশ প্রদান সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। বিভিন্ন পেশাগত দুর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণা ও দুর্ঘটনা রোধকল্পে সুপারিশ প্রণয়ন। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত রিপোর্টিং এর উপর গবেষণা। এছাড়া পেশাগত ব্যাধি সংক্রান্ত গবেষণা এবং OSH সংক্রান্ত আইন ও পলিসি তৈরিতে সহায়তা প্রদান।

কনসালটেন্সি সার্ভিস:

ইনস্টিটিউটে ফি প্রদান করার মাধ্যমে বিভিন্ন আগ্রহী ব্যক্তি, গ্রুপ বা প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ সেবা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট (স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা), দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও রিপোর্টিং, কর্মপরিবেশ অ্যাসেসমেন্ট, পিপিই ব্যবস্থাপনা, শিল্প বর্জ্য/বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা, কর্মক্ষেত্রের আলো ও বাতাস মনিটরিং, রাসায়নিক এক্সপোজার ও সুপারিশ ও সম্পূর্ণ OSH সলিউশন।

এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য সামগ্রিক কৌশল হবে নিম্নরূপ:

১. শিল্পক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রামগুলো তৈরি ও পরিচালনা করা;

২. OSH পেশাজীবী ও সকল অংশীজনদের মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে রোল মডেল হিসেবে প্রস্তুত করা;

৩. দেশব্যাপী পরিষেবা প্রচারের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অন্যান্য কার্যালয়গুলো কে যথাযথভাবে ব্যবহার করা;

৪. প্রতিষ্ঠানটিকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগিদের সহায়তা ও সমর্থন অর্জন করা;

৫. পরিচালিত কোর্সসমূহের দেশী ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন, যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের কাজের ক্ষেত্রে আরও ভালোভাবে স্বীকৃত হয়;

৬. প্রতিষ্ঠানটিকে নির্দিষ্ট কোর্স ও OSH সম্পর্কিত বিভিন্ন টেস্টের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা;

৭. বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এবং বাংলাদেশের অন্যান্য OSH প্রবিধানে সংশোধন এনে শিল্পক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদের জন্য OSH প্রশিক্ষণ প্রদান বাধ্যতামূলক করা;

৮. ক্রমবর্ধমান উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়া ও পেশাগত স্বাস্থ্যের উপর গবেষণা পরিচালনা করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা।

আশা করা যায়, NOSHTRI-এর কার্যক্রম পরিপূর্ণভাবে চালু হলে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের শিল্পখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি শ্রম অধিকার রক্ষা ও শোভন কর্মপরিবেশ বাস্তবায়নে নিয়ামক ভূমিকা রাখবে। একইসাথে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশী পণ্য ও সেবার ব্র্যান্ডিং ইমেজ সৃষ্টিতে এই প্রতিষ্ঠানটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। সর্বোপরি বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রতিষ্ঠানটি যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেজন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বদ্ধ পরিকর।

Contribution of Labour Inspection to the Improvement of Labour Law

Md. Masum Billah
Law Officer, Department of Inspection for Factories and Establishments

Introduction

During the International Labour Organization (ILO) governing body's 350th session in Geneva, Switzerland, the government affirmed its dedication to establishing a labour-friendly environment within the nation. This commitment was underscored by its emphasis on fostering essential labour relations aimed at advancing the welfare of workers, in line with honourable Prime Minister Sheikh Hasina's initiatives. These initiatives are imbued with the spirit of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's vision to cultivate a Bangladesh free from poverty and exploitation.

The roadmap on the labour sector in Bangladesh and four priorities areas

The roadmap on the Labour Sector in Bangladesh (2021–2026) is a commitment of the Government of Bangladesh to uphold labour rights and workplace safety in the country.[1] The road map contains specific actions on legal and administrative reforms as well as enforcement of laws and training and promotional activities.[2] Accordingly, the road map had been developed under four priority areas with a series of specific actions set against timelines.[3] These four priority areas are: (1) labour law reform; (2) trade union registration; (3) labour inspection and enforcement; and (4) addressing acts of anti-union discrimination/unfair labour practices and violence against workers.[4]

DIFE as national labour inspectorate and its key functions

Labour inspection plays an important role in protecting employees' rights, ensuring health and safety at the workplace and combating unsafe working environments, preventing breaches of employment protection rules and promoting fair and socially responsible economic growth.[5] Labour law reform, labour inspection and enforcement are closely interlinked for the protection of the rights of workers and ensuring better and safe working environment. Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) is responsible for labour inspection under the Bangladesh Labour Act, 2006 and Bangladesh Labour Rules, 2015. Labour Inspectors of DIFE perform their functions and exercise the powers enumerated in Section-319 of BLA, 2006, and Rule-351 of BLR, 2015. The key functions carried out by DIFE include:

1) approval of factory's machinery layout plan;

2) issue and renewal of licenses to enterprises under its jurisdiction;

[1] GB.347/INS/15(Rev.2)
[2] ibid
[3] Ibid
[4] Ibid
[5] European Parliament resolution of 14 January 2014 on effective labour inspections as a strategy to improve working conditions in Europe (2013/2112(INI)

3) inspection of the enterprises for enforcement of relevant provisions of BLA in terms of working conditions, safety & health and welfare of the workers;

4) sharing knowledge and experiences with workers and employers and advising them on labour laws, rules and regulations;[6]

5) conducting investigations on complaints received on labour law violations, investigation of occupational accidents and diseases,

6) conducting conciliation meeting or discussion to ensure the realization of wages or other legal dues of a worker or workers upon application;

7) reporting on labour inspection, wage administration, conditions of work and occupational safety and health (OSH).[7] and

8) to file criminal cases before the Labour Court against non-compliant employer and management authority for ensuring sufficiently dissuasive sanctions.

International Labour Standards: the crucial functions of labour inspectorates

Whilst labour inspectorates and attendant enforcement bodies are national in their operation, their rise globally has been tied to the prominence of supranational institutions and, in particular, the ILO. The ILO, a specialized agency of the United Nations, has identified state-led labour standards inspections as key to detecting and addressing workplace exploitation. In this respect, its Convention on Labour Inspection (No. 81, 1947) establishes expectations for national-level labour inspectorates, including three core objectives.[8] The functions of the system of labour inspection shall be:

a. To secure the enforcement of the legal provisions relating to conditions of work and the protection of workers while engaged in their work, such as provisions relating to hours, wages, safety, health and welfare, the employment of children and young persons, and other connected matters, in so far as such provisions are enforceable by labour inspectors;

b. To supply technical information and advice to employers and workers concerning the most effective means of complying with the legal provisions; and

[6] The Labour Inspection in Bangladesh 2014-2018, p. 17. Published by the Department of Inspection for Factories and Establishments, December, 2021.
[7] Labour Inspection Governance in Bangladesh, ILO Brief, April 2020. P.1.
[8] Thomas Hastings and Andrew Herod (2024).''Labour geography and the state: Exploring labour's role in working against, with and through the state to improve labour standards'' Economy and Space, Vol. (1), p.64.

c. To bring to the notice of the competent authority defects or abuses not specifically covered by existing legal provisions.[9]

Labour inspection institutions have a two-fold nature. On the one hand, they supervise the enforcement of labour laws, particularly with regard to workers' rights. On the other hand, labour inspectorates provide information and advice, as well as training. This dual nature means that labour inspection is a well-suited tool for good governance as well as ensuring fairness in the workplace. [10]

Adapting legislation with the changing needs and the labour inspectorate

While the impacts of COVID-19 continue to play out across Bangladeshi society climate change threats intensify, the world of work continues to rapidly evolve, driven by technological change in areas including digitalization, the emerging platform economy, artificial intelligence, and automation.[11] The forms and frameworks of the employment relationship, production processes and technologies used at the workplace are changing increasingly fast.[12] It is essential that relevant legislation keep pace with these changes if the workers in new employment relationships or abusive conditions of work are not to suffer as a result of an inadequate legal framework.[13]

In accordance with Article 3, paragraph 1(c) of the Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81), and Article 6, paragraph 1(c) of the Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129), it is stipulated that the labour inspectorate is mandated to apprise the competent authority of any deficiencies or irregularities not expressly addressed within the existing legal framework. Moreover, Convention No. 129 extends the scope of responsibilities by granting the authority to labour inspectors to proactively propose amendments or enhancements to prevailing laws and regulations, thereby underscoring the pivotal role of labour inspectorates in ensuring regulatory efficacy and continuous improvement in labour standards enforcement. Because of their free access to workplaces and special relationship with employers and workers, labour inspectors are potentially the public officials in the best position to identify situations that might call for legal and legislative solutions aimed at improving protection at work.[14]

---

[9] Article 3 of the ILO Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81).The ILO's Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) contains nearly identical provisions in Article 6.

[10] https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/Recommendations-of-the-1st-6th-ASEAN-Labour-Inspection-Conference.pdf(last visited on 13.03.2024)

[11] ILO, Decent Work Country Programmes for Bangladesh 2022-2026, Dhaka, International Labour Office, 2023, p.13.

[12] ILO General Survey on Labour Inspection (2006), p.45.

[13] Ibid

[14] ILO General Survey on Labour Inspection (2006), p.45.

This privilege also assigns labour inspectors the role of catalysts for labour law review, by identifying gaps or ambiguities within the legislation and proposing best practices to integrate into national law. These practices, which have long been upheld in numerous enterprises, aim to foster a working environment devoid of exploitation, intimidation, discrimination, harassment, violence, and occupational risks and hazards. Such initiatives ultimately benefit both employers and workers. If it is properly understood and properly carried out, it should promote the introduction of new protective measures.[15] The improvement of labour law by labour inspectorate may be materialized in four ways:

a) **Through periodical reports**: Although the Conventions do not specify the way in which inspectors should fulfil their function of informing the competent authority, it would appear that the most practical means of achieving this would be through the periodical reports they are required to submit to the central inspection authority.[16] They should be allowed to decide what information should be included in a given report, in the light of the urgency or nature of the situation.[17] It will then be for the central authority to determine whether to take or request appropriate legislative action.[18]

b) **Through drafting legislation and participating in the work of governments' concerned advisory bodies**: Labour inspection services are to a certain extent involved in the process of drafting labour regulations. This involvement can sometimes be more direct, such as when a representative of the inspectorate takes part in the work of advisory bodies on labour affairs.[19] In Denmark, the Danish Working Environment Authority is responsible, inter alia, for assisting the Ministry of Employment in the drafting of regulations made under the Working Environment Act.

c) **Through consultation during the process of labour law reform**: Recommendations for such action may be made by the labour inspectorate and discussed in tripartite labour advisory bodies, where they exist.[20] Further, where appropriate, labour inspectors should also be consulted by the competent authorities during the process of labour law reform.[21]

d) **Legal clarification and explanation**: If labour law contains a provision to supplement or clarify or explain existing legislation which may be published in the form of orders, circulars or instructions either by the labour inspectorate or by the controlling authority (Ministry), it allows no vacuum or discrepancy for the enforcement of workers' rights. The absence of any ambiguity in enforcing of and complying with national labour standards will absolutely enrich collaboration between inspectors and employers, build

[15] ILO General Survey on Labour Inspection (1985), p.36
[16] The requirement for labour inspectors to submit periodical reports to the central inspection authority is set out in Article 19 of Convention No. 81 and Article 25 of Convention No. 129.
[17] ILO General Survey on Labour Inspection (2006), p.45.
[18] Ibid
[19] ILO General Survey on Labour Inspection (1985), p.36.
[20] ILO General Survey on Labour Inspection (2006), p.45.
[21] Ibid

trust between employers and workers and avoid workplace conflict which will promote sustainable investment climate.

Conclusion:

Labour inspection plays a crucial role in improving labour law in Bangladesh, ensuring compliance with regulations, promoting fair practices, and safeguarding worker well-being. Aligned with international standards set by the ILO, labour inspection serves both enforcement and advisory functions, facilitating the adaptation of legislation to evolve workforce dynamics. Through periodic reporting, active participation in legislative drafting, and consultation during reform processes, labour inspectorates contribute proactively to shape laws that foster inclusivity and safety. By bridging regulatory frameworks with practical realities, labour inspection enhances labour rights, mitigates workplace hazards, and promotes a just and equitable society.

Emerging Occupational Safety and Health hazards in the plastic sector

AKM Masum Ul Alam
OSH Specialist and Adjunct Faculty
Department of Occupational Health and Environment
Bangladesh University of Health and Sciences

Plastics are found in all aspects of modern life, including the world of work. Whilst the environmental impacts of plastic pollution are widely recognized, the adverse impacts of exposure to plastics on workers' health should now also be considered a priority. Workers in numerous industries are exposed to harmful additive chemicals in plastics, which have been linked with immune, endocrine and reproductive system dysfunction, as well as cancers and birth defects.

Plastics are found part of our life, including the world of work. Their flexibility, durability and low cost have made them essential components of billions of modern products, with an ever-expanding range of applications. At current rates, plastic packaging volumes are expected to more than quadruple by 2050 to 318 million tonnes per year (World Economic Forum 2016). However, plastics contain and leach hazardous chemicals, which have been linked with cancers, birth defects and impairments to the immune, endocrine and reproductive systems (Rustagi et al. 2011). Workers in numerous industries use plastics during the course of their work and may therefore be at risk of harmful chemical exposures, depending on the variety of plastic and type of exposure. In the plastics industry alone, millions of men and women work through its entire value chain, from production to transformation, collection and recycling. Many are in the informal economy, where occupational safety and health (OSH) regulations and social protections are limited or poorly enforced. The costs to individuals, their families and society may be considerable

What are plastics?

Plastics are a group of polymers, either synthetic or naturally occurring, that can be moulded into solid objects of various shapes. They are mostly derived from fossil fuel-based chemicals, such as natural gas, coal or petroleum, although some come from renewable biological substances, such as vegetable fats and oils. Plastics are used to make a large range of products due to their unique properties.

Global plastics production

Cumulative global production of primary plastic between 1950 and 2017 is estimated at 9,200 million metric tonnes and is forecast to reach 34 billion metric tonnes by 2050 (Geyer 2020). Plastics are utilized across many sectors, including construction, textiles, consumer products, transportation and electronics, as well as to produce packaging . The packaging industry is by far the largest user of plastics, with construction and textiles also major users. Primary plastics production rose for all sectors and is expected to continue increasing.

Light, strong and seemingly inexpensive plastics have permeated our lives, our societies and our economies – but at a pace that has escalated into significant costs to the environment, human health and the economy. Currently, the world produces 430 million metric tons of plastics each year (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] 2022), of which over two-thirds are short-lived products which soon become waste, and a growing amount (139 million metric tons in 2021 [Minderoo 2021]) after one single use.

Consumption of Plastic in Bangladesh

Bangladesh faced a sharp increase in both plastic use and pollution. In the last 15 years, Bangladesh's annual per capita plastic consumption in urban areas tripled to 9.0 kg in 2020 from 3.0 kg in 2005. Consumption of LDPE packaging materials (plastic bags, etc.) increased fivefold in 2020 from 2005. Of the 977,000 tons of plastic consumed in 2020, only 31 percent were recycled. Most mismanaged plastic waste was single-use plastics like shopping bags, packs, and wrappers.

The capital Dhaka's annual per capita plastic consumption is more than three times the national average for urban areas and stands at 22.25 kg. About 646 tons of plastic waste is collected daily in Dhaka, which is 10 percent of all wastes generated in Bangladesh. Only 37.2 percent of the plastic waste in Dhaka is recycled.

The average per capita plastic consumption in European countries is more than 100 kg -- much higher than in Bangladesh. But Bangladesh is one of the top plastic polluted countries due to mismanagement of plastic waste.

Exposure to plastics in the workplace

Workers are exposed to hazardous chemicals during all stages of plastic lifecycle. This includes during the extraction of fossil fuels used to make plastics, the production of different plastics, and their final disposal, when they are recycled, incinerated or discarded. Safety and health impacts can result from plastic particles themselves or additive chemicals associated with plastics. Effects on human health will vary depending on the substance type and route of exposure, either via inhalation, ingestion or dermal contact.

Workers in the plastics industry face acute and chronic health risks due to their increased risk of exposure to hazardous chemicals. Plastics are usually processed as pellets, granules or powders. When manufacturing or processing plastics, chemicals are either used to make the plastic, are added to the product as additives, or are produced as a by-product through the process, for example in the form of plastic fume . Workers are exposed to these chemicals mainly when materials are heated to make them more pliable for creating plastic products. Workers and surrounding communities may also be at risk of chemical exposures from uncontrolled releases, for example, due to major industrial accidents.

Plastics and the health of workers

Despite plastics providing significant benefits, current production methods, including extraction, use, and disposal of plastics, have many drawbacks for human health and the

environment. Pure plastics have low toxicity due to their insolubility in water and are biochemically inert because of a large molecular weight.

Plastic products contain hazardous chemical additives, which have been associated with serious health concerns such as hormone-related cancers, infertility and neurodevelopment disorders, like attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and autism.

These are fragments of plastics less than 5mm, which we eat, drink and breathe in every day. Microplastics cause damage to human cells, leading to cell death, allergic reactions and other adverse health impacts. Chemical additives in every plastic item contains chemical additives that determine the properties of the material and influence the cost of production.

How workers are exposed to chemical additives

Workers may be exposed to plastics during the entire life span of plastic products, from manufacturing and use, to recycling, waste management and disposal. Additives may be weakly bound to the polymer matrix and so can leach out of the plastics during normal use or following improper disposal in the environment (Wagner and Schlummer 2020). Many additives are highly hazardous and are a significant concern to occupational health. Some are regulated internationally, for example, under the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. Other additives proven to be harmful are heavy metals, such as cadmium, chromium, lead and mercury, which are now banned for use in plastics production in many regions.

Priority actions for protecting workers

Plastics bring new risks to the safety and health of workers. Priority actions to protect workers from hazardous chemical exposures in plastics should be implemented at both the policy level and the workplace level, with a strong foundation of social dialogue throughout. Prevention measures should use an integrated OSH systems approach, with plastics exposures considered at all stages of occupational risk assessments. Evidence should be matched to policy initiatives that consider the new and known risks associated with occupational plastics exposures, including plastics additives and microplastics.

Source of Information:

1. Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] 2022),
2. Hazardous exposures to plastics in the world of work [Research Report 2023, ILO]
3. Turning off the Tap How the world can end plastic pollution and create a circular economy, [UN Environment Programme Report, 2023]
4. Towards a Multisectoral Action Plan for Sustainable Plastic Management in Bangladesh[World Bank Report, 2021]
5. WRAPPED IN PLASTIC: The State of Plastic Pollution in Bangladesh [Breifing note, CPD]
6. World Economic Forum, 2016

Behind The Scene:
Tackling occupational safety and health issues

Ole R. Justesen
Sector Counsellor (OHS), Royal Danish Embassy

Imagine a worker at a factory not only endures the demands of their tasks, but also the relentless heat inside and outside the factory. Temperatures suddenly become more than numbers; a wish for a better work environment. A recent study by Cornell University's Global Labour Institute and Schroders reveals that workers in Dhaka miss an average of three days of work per month due to temperature-related illnesses (from May-July), a concern intensified by rising temperatures resulting from climate change. It is clear that action is needed now more than ever.

Adding to this challenge is the often neglected issue of ergonomics. Workers facing neck and shoulder pain due to repetitive tasks and poor ergonomics find themselves caught in a cycle of discomfort, affecting not only their well-being but also impacting the productivity of the factory they work in. A Danish research study led by University of Southern Denmark shows the harsh reality faced by workers, highlighting the importance of ergonomics. Both studies point to the fact that empowering and genuinely listening to workers is crucial if we are to address health and safety risks within their jobs.

The Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE), Bangladesh and the Danish Working Environment Authority are taking a proactive role, particularly addressing neglected areas like ergonomics, recognising that compliance with safety and health standards benefits both workers and factories. Creating a workplace that prioritises the well-being of workers not only enhances productivity but also reduces illness-related costs.

It is essential that every workplace in different industries, such as RMG, agriculture, steel, pharmaceuticals and so on, focus on ensuring a better work environment. Improving occupational safety and health standards at factories and establishments is critical for increasing and maintaining the competitiveness of Bangladesh’s industries. The increasing demands for products produced under socially sustainable working conditions and the discussions on a new due diligence directive from the European Union underscores the importance of a decent and safe working environment. Labour inspectorates play a significant role in Bangladesh’s journey towards becoming a sustainable production hub, through inspection, motivating compliance, and training.

DIFE and the Danish Working Environment Authority (DWEA) are working together in Bangladesh to ensure labour inspectors and industries are equipped with skills and knowledge on occupational safety and health. Together, they developed courses for industries on various occupational safety and health issues. From chemical and machinery safety to ergonomics and dialogue, these courses provide valuable insights for both employers and workers, empowering them to prioritise safety in the workplace.

As part of this cooperation Bangladeshi and Danish labour inspectors regularly visit factories together, as part of peer-to-peer learning activities under the two governments' sector cooperation. The visits show the steps, which have been made towards social sustainability in the garment production, with investments in personal protective equipment, needle guards, and clean hallways. Despite positive progress, there is still work needed to be done, particularly in non-export-oriented factories and sectors.

Denmark is a long-standing partner to Bangladesh on decent work, and in the coming years, we will work to expand our bilateral partnership for sustainable growth in the RMG sector and beyond. For instance, Denmark supports Bangladesh with implementing the ILO Road Map and the EU National Action Plan for the Labour Sector via ILO, participating in initiatives like the partnership for cleaner textile, and offering supply chain advisory for building an environment for sustainability. Denmark understands the need for a strong and effective labour inspectorate in Bangladesh as it strives to become a sustainable production hub.

Occupational Safety and Health: a new Training Center in Rajshahi and how to consolidate the governance of an Industrial Safety Framework

Dr. Michael Klode
STILE Project, GIZ

The National Occupational Health and Safety Day is celebrated each year in a participatory manner. While it is a great occasion to celebrate success, it is also a reminder to continue strengthening efforts towards safe and decent workplaces.

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is commissioned by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) to work with DIFE on different paths of implementation. Under the Sustainability in the Textile and Leather Industries (STILE) project, in the past 12 months we have continued to support the update and maintenance of the Labour Inspection Management Application (LIMA) system, especially from the perspective of the inspection module. In order to implement DIFE´s Digitization Strategy (2023), data driven decision making is a core element to enhance effectiveness and transparency for a SMART DIFE.

DIFE has completed an impressive implementation of the construction of the National Occupational Safety and Health Training and Research Institute (NOSHTRI) premises in Rajshahi. We have supported linking the FBCCI Safety Cell with NOSHTRI, in order to prepare the industry for reaching out to NOSHTRI (not only in Rajshahi, but as a nationwide institution) as a provider of training and knowledge. One political element to strengthen NOSHTRI could be that MoLE includes in a revised BLA/BLR that all Safety Officers and Safety Committees need to have a NOSHTRI accredited or provided training.

When Safety Officers, managers or workers will be trained by NOHSTRI – either in Rajshahi or anywhere else in Bangladesh – they will and should experience practice-oriented exposure. A great example can be seen in the construction sector simulation room installed at the Airport site. Similar setups we experienced when travelling with DIFE and MoLE colleagues to Germany in late 2022. That is why the German Cooperation is supporting two virtual reality-based labs for DIFE, as well as equipping simulation labs with physical equipment.

When we look at the state of things regarding Occupational Safety and Health in Bangladesh, there is a broad range, from high-level modern factories to very simple workshops or even informal establishments. Noise, dust, ergonomic issues and exposure to chemicals or risks of accidents, especially from fire and electric safety issues, are still frequent.

In that sense, it is not only a Governmental responsibility to protect the rights-holders, but also an interest of the private sector to enable the best possible working conditions. The intended coordination between Ministries and authorities under what has been named “Industrial Safety Framework” is an excellent path. The governance of occupational safety and health is an interdisciplinary exercise. It starts from the communication in the establishment, were safety concerns should be rewarded and on the top of the agenda of owners and management. It continues with identifying ways to prevent and improve: FBCCI Safety Cell, for example, has a brilliant analysis on short-term and mid-term measures possible in commercial buildings and shopping malls/markets.

And it continues with robust monitoring. Together with other stakeholders we have supported DIFE in consolidating the Labour Inspection Management Application https://lima.dife.gov.bd/ And while we are aware that the ratio of inspections and inspectors versus factories and establishments makes it very difficult to implement inspections in all formal (and informal) establishments and factories, we can continue consolidating the inspection planning and the inspection monitoring processes. Processing the data provided by the inspections is key to, for example, identify patterns in specific districts, in specific industries or even the accuracy of the information provided.

And it can even help other authorities: if a DIFE inspector, for example, identifies a Participation Committee in a factory: why not forward this to the Department of Labour, so they can check whether it is registered or not?

The German Cooperation is proud to work with the Government on Bangladesh on many topics. DIFE has achieved many great things in the last year and the last years.
Best wishes for a happy OSH Day and a year with as much health and safety as possible!